সিলেট জেলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা: একটি সমীক্ষা

অধ্যাপক ড.আ.ক.ম. মাহবুবুজ্জামান*

Abstract

The fishermen community is one of the oldest communities in Bangladesh. They are living on the banks of various rivers, haors, baors, beels, canals, lakes and the coasts of the Bay of Bengal. As occupation of this community nurtures and captures fishes, and supplies those to the local and national markets. A good number of the local people depend on this occupation for their livelihood and they are known as 'Fishermen Community'. Nowadays there are no free areas for fishing and, by rules of the government; they have to take lease for fishing. Sylhet district is rich by its haors, beels, canals, lakes and rivers. Many fishermen villages are situated in this district. Eight villages have been selected from Tuker Bazar Union of Sylhet Sadar Upazila for studying the present socio-economic conditions of the fishermen community. People within this community are relatively poor, hard working and painstaking. Paucity of getting natural fish in above mentioned sources is considered a great problem nowadays. They have no capital to take lease of fishing sources by their own and they are afraid of loosing their credited money to invest in them. Therefore many of them are withdrawing themselves from their fishing occupation and migrating in other occupations like fish selling, vegetables sellings, operating grossery shops, small vehicles driving, creating nurseries, receiving jobs in various offices and factories, etc. This type of migration is now causing extinction from their community occupation. Fishermen of two villages of the study area have already quitted their occupation and many people of other villages also quiting slowly. This denotes their deplorable condition of combating to stay on their own occupation. The policy makers should consider the facts revealed in this study.

* অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রারম্ভ

মৎস্য আহরণ একটি অতি প্রাচীন পেশা। অনেকে এ পেশাটিকে আদিম পেশাগুলোর মধ্যেকার একটি বলেও অভিহিত করে থাকেন। এটি প্রায় বন্য পশু শিকারের যুগের একটি পেশা হিসেবে পরিগণিত। পেশাটির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলোকে সাধু বাংলায় 'মৎস্যজীবী' বলা হলেও চলিত বাংলায় তারা 'জেলে' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ২০০৯ সালে প্রকাশিত "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯" অনুসারে জেলে বা মৎস্যজীবীকে এই রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন (ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯)।"

যে কোন কারণেই হোক না কেন এই সম্প্রদায়টি চিরকালই অবহেলিত ছিল। এর মূল কারণ ছিল মৎস্য আহরণকারীদের জীবন যাপন পদ্ধতি। জলাশয়ে (নদী, খাল, বিল, হাওর, সাগর, দিঘি, পুকুর প্রভৃতি) মাছ ধরার ক্ষেত্রে তাদের সময়ের কোন বাছ-বিচার থাকে না। দিনের ও রাতের যে কোন অংশেই তাদের মৎস্য আহরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ফলে খাবার গ্রহণের নির্ধারিত সময় তাদের থাকে না। তাদের কাপড়-চোপড় প্রায়শই ভেজা থাকে। আর সারা শরীর ও কাপড় চোপড়ে থাকে মাছের আঁশটে গন্ধ। সেই গন্ধ শুকিয়ে গিয়ে উৎকট গন্ধে পরিণত হয়। তাছাড়া, তাদের সারা বাড়ি জুড়ে থাকে মাছের আঁশটে গন্ধ আর মরা ও শুটকি মাছের পুঁতি গন্ধ। ফলে প্রাচীনকাল থেকেই মৎসজীবীরা পল্লী গ্রামের এক প্রান্তে থাকতো অথবা পৃথক গ্রামে তাদের বসবাস করতে হতো। কালক্রমে তাদেরকে পৃথক একটি সমাজ বা গোষ্ঠি হিসেবে চিহ্নিত করা হতে থাকে। বাংলা ভাষার বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে 'জেলে পল্লী' নামে তাদের পৃথক গোষ্ঠি হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

জেলেদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয়ই আছে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের জেলের সংখ্যাই বেশি। যদিও ভারতবর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জেলে সম্প্রদায়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। যেহেতু তারা পৃথক গোষ্ঠি হিসেবে বহুদিন থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে, তাই হিন্দু ধর্মের বর্ণ বিন্যাসে তারা 'শূদ্র' বর্ণে এবং ইসলাম ধর্মের শ্রেণি বিন্যাসে তারা 'আতরাফ' শ্রেণি (যেটি এখন আর তেমন প্রচলিত নাই, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর ফারায়েজী আন্দোলনের পরে তা ক্রমশ অকার্যকর) হিসেবে বিবেচিত ছিল। এখন ইসলাম ধর্মে আতরাফ শ্রেণি কার্যকর না থাকলেও জেলেদের বিয়ে ও অন্যান্য সামাজিক কার্যাবলী অদ্যাবধি কেবল তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রাচীন কাল থেকে 'মাছে ভাতে বাঙালি' বলে যে প্রবাদ এ দেশে বিদ্যমান, সেই মাছের যোগান আসতো এই সম্প্রদায়ের নিকট থেকেই।

মোগল বা নবাবী আমলে তো বটেই, বৃটিশ আমলেও তাদের মৎস্য আহরণ ছিল অবারিত। যে জেলে যে অঞ্চলে বাস করে, সেই অঞ্চলের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওরে তাদের মৎস্য আহরণে কেউ বাদ সাধতো না। ফলে তাদের জীবন যাপনে অভাব অনটন তেমন তীব্র হয়ে কখনও দেখা দেয়নি। পাকিস্তান আমলে জেলেদেরকে নিবন্ধিত করা হয় এবং তালিকাভুক্তদের জন্য বিভিন্ন নদ-নদী ও খাল-বিলে কিছু টাকার বিনিময়ে বার্ষিক ইজারা প্রথা চালু করা হয়। সেই প্রথাতেও তাদের তেমন একটা সমস্যা হয়নি। তারা নাম নথিভুক্ত করে কিছু টাকার বিনিময়ে ইজারা নিয়ে গোষ্ঠিগতভাবে মাছ ধরতো। তাতে তাদের আয় কিছু কমলেও অনটন হতো না। জেলে সম্প্রদায়ের লোকদের প্রধান পেশা চিরকালই মাছ ধরা ছিল, তবে খুব সামান্য

কিছু জমি তারা চাষ করতো। এই জমি হয় তাদের নিজস্ব মালিকানাভুক্ত ছিল, অথবা তারা অন্যের জমি নিয়ে বর্গা চাষ করতো। গ্রীষ্মকালে মাছ ধরার কাজটি বন্ধ থাকতো, তখন তারা কৃষি কাজ বা জাল বোনার কাজ করতো। সেই ফসল বা ঘরে তৈরি জাল হাট বাজারে বিক্রি করে তাদের সংসার চালাতো। বলতে গেলে গ্রীষ্মকালটাই ছিল তাদের অনটনের কাল। বাংলাদেশ আমলের প্রথম দিকে তাদের মাছ ধরতে বা জলাশয়ে মাছ পেতে তেমন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পরে গঙ্গা/পদ্মা ও তার শাখা নদীসমূহে মাছের আকাল দেখা দেয়। ফলে বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি এলাকার জেলেরা নদীতে বা উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ তেমন একটা পেতো না। তখন তারা হাওর, বাওর, দিঘি, বিল প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু কৃষি জমিতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে হাওর, বাওর, দিঘি ও বিলে মাছের আকাল তীব্রতর হয়ে ওঠে। ক্রালক্রমে বাংলাদেশের প্রায় সকল নদীতেই মাছের আকাল পরিলক্ষিত হতে থাকে। ফলে জেলে পল্লীগুলোতে হাহাকার শুরু হয় জীবিকার অভাবে।

এর সঙ্গে নতুন আরেকটি উপসর্গ যোগ হয়। প্রতাপশালী কিছু গোষ্ঠি 'মৎস্যজীবী' নামে তাদের সমিতি তালিকাভুক্ত করে বেশি টাকা দিয়ে জলাশয়সমূহ ইজারা নেয়া শুরু করে। প্রত্যক্ষ টেন্ডারে তাদের প্রদত্ত দরের কাছে জেলে সম্প্রদায় আর লিজ নেবার সুযোগ পায় না। এই স্বার্থান্বেষী মহল এতই শক্তিশালী যে, অসংগঠিত জেলে সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে টাকার খেলায় পরাজিত হতে বাধ্য হয়। দু'চারটি এলাকায় জেলে সম্প্রদায় সংগঠিত হয়ে কিছু জলাশয় লিজ নিতে সক্ষম হলেও নতুন উৎপাত আসে চাঁদাবাজির। সেই জ্বালাতন সহ্য করে তাদের যা আয় হয়, তাতে সংসার চালানো সম্ভবপর হয় না। একান্ত বাধ্য হয়েই তারা পেশা পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, জেলে পল্লী নামে থাকলেও সত্যিকার জেলে সম্প্রদায়কে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে এখন রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রভৃতি পেশায় রূপান্তরিত জেলে ব্যক্তি ও পরিবারকে দেখতে পাওয়া যায়।

সিলেট জেলায় সুরমা-কুশিয়ারা নদীসহ অসংখ্য হাওর, বিল, খাল ও দিঘি এখনও বিদ্যমান। এই এলাকায় প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নে দশ-বিশটি জেলে পল্লী ছিল। যেগুলোর অনেকগুলো এখন নামেই কেবল জেলে পল্লী। নামমাত্র কিছু লোক এখন এই পেশাটির সঙ্গে জড়িত আছে, তারাও অনেকটা মৌসুমী জেলে। বছরের বেশির ভাগ সময় তারা দ্বিতীয় পেশা বা পরিবর্তিত পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে 'টুকের বাজার' নামে একটি ইউনিয়ন রয়েছে, যার ৮টি গ্রাম ছিল জেলে পল্লী। সর্বশেষ ২০১১ সালে সেই গ্রামগুলোতে মোট ২৪৭টি জেলে পরিবার বাস করতো (হোসেন, ২০১১)। এখন ২টি গ্রামে কোন পরিবারই জেলে হিসেবে আর নাই, সকলেই পরিবর্তিত পেশায় চলে গেছে, তবে জেলে সম্প্রদায় তাদেরকে নিজেদের লোক বলে দাবি করে। বাকি গ্রামগুলোর প্রায় শতকরা ৫০ভাগ জেলে পরিবার বর্তমানে পরিবর্তিত পেশায় চলে গেছে। যারা এখনও জেলে পরিচয়ে রয়েছে, তাদের দ্বিতীয় পেশাটি ক্রমশ প্রথম পেশার স্থান দখল করার পথে রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি

১. জেলে পরিবারগুলোর বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা
২. তাদের পেশা পরিবর্তনের কারণসমূহ উদ্ঘাটন করা

৩. গৃহীত পেশাসমূহ ও তাদের বর্তমান আয় সম্পর্কে অবগত হওয়া
৪. যারা এখনও জেলে পেশায় রয়েছে, তাদের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করা

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি একটি উদ্ঘাটনমূলক গবেষণা। সিলেট জেলার সদর উপজেলার টুকের বাজার ইউনিয়নের ৮টি গ্রামের উপর এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। গ্রামগুলোর নাম হচ্ছে, শেখপাড়া, চরুগাঁও, সাহেবেরগাঁও, হায়দারপুর, পীরপুর, শাহপুর, টুকেরগাঁও/ঘোপাল ও গৌরিপুর। এই গ্রামগুলোতে প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম ও হিন্দু জেলে সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। বর্তমানে জেলে পরিবারগুলো সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গেছে। ৮টি গ্রামের মধ্যে প্রাচীন জেলে পল্লী পীরপুর ও শাহপুরে পূর্বকালে যারা জেলে ছিল, তারা সকলেই পরিবর্তিত পেশায় চলে গেছে। বর্তমানে কোন পরিবারই এখন আর মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত নেই। অন্যান্য গ্রামগুলোতেও পেশার পরিবর্তন দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অনুসূচিসহ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফ জি ডি) ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বমোট ৮ টি গ্রামের ২৪৭টি জেলে পরিবার থেকে প্রতি গ্রামে ১০টি করে দৈবচয়িতভাবে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে মোট ৮০টি জেলে পরিবারকে নিয়ে এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, যারা গবেষণা বিষয়ে কোর্স সম্পন্ন করেছে। গবেষক নিজে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পদ্ধতিতে উপস্থিত থেকেছেন এবং উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি তত্ত্বাবধান করেছেন। উত্তরদাতাদের ঘর-বাড়ি, পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসা সুবিধা ও গ্রহণ পদ্ধতি এবং সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সিলেট জেলার সদর উপজেলার একটি মানচিত্র এখানে সংযুক্ত করা হলো, যেখানে সমীক্ষীত এলাকাসমূহ সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে:

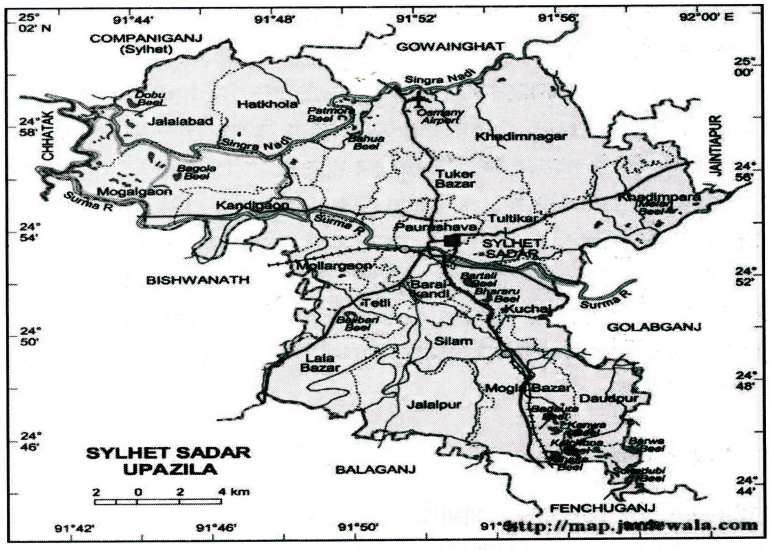

প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

১. আর্থ-সামাজিক অবস্থা

১.১ পরিবার সংখ্যা ও বয়সসহ মোট জনসংখ্যা

পর্যবেক্ষিত মোট ৮টি গ্রামের প্রাচীন জেলে পরিবারের সংখ্যা ২৪৭টি। তাদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ৪৩৭ জন। তার মধ্যে কিছু পরিবার এখন আর মৎস্য আহরণ পেশায় রত নেই। তবু তাদেরকে পূর্বতন পেশা ও বংশগত কারণে 'জেলে' হিসেবে সকলেই অভিহিত করে থাকেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি গ্রামেই জেলে পরিবারগুলো এখন সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। গ্রামগুলোতে অবস্থানরত বাকি পরিবারগুলোর অধিকাংশই অবস্থা সম্পন্ন মুসলিম আর সামান্য কিছু মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার রয়েছে। মোট ৮০টি নমুনা পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৪৬, যা জাতীয় পারিবারিক সদস্যদের গড় হার (৪.৬০) থেকে বেশি। সম্ভবত শিক্ষার হার কম থাকায় তাদের মধ্যে ছোট পরিবার গঠনের ধারণাটি তেমন একটা গড়ে ওঠেনি। অনূর্ধ্ব ৯ বছর বয়স্ক শিশুদের সংখ্যাই পরিবারগুলোতে বেশি (২৩.৮০%)। আরও উল্লেখ্য, তাদের ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী লোকের সংখ্যা জাতীয় হারের চেয়ে কম, প্রায় ৮ শতাংশ। সারণি নং ১.১-এ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা দেখানো হয়েছে:

সারনি ১.১ নারী ও পুরুষ ভেদে পরিবারের সদস্যসংখ্যা

বয়স (বছর)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট	শতকরা
অনূর্ধ্ব ০৪	৩৩	২৭	৬০	১৩.৭৩
০৫-০৯	২১	২৩	৪৪	১০.০৭
১০-১৪	১৮	১৪	৩২	৭.৩২
১৫-১৯	১৭	২২	৩৯	৮.৯৩
২০-২৪	১৮	২৩	৪১	৯.৩৮
২৫-২৯	২০	১৩	৩৩	৭.৫৫
৩০-৩৪	১২	১৫	২৭	৬.১৮
৩৫-৩৯	১৭	১৪	৩১	৭.০৯
৪০-৪৪	১৩	১২	২৫	৫.৭২
৪৫-৪৯	১৪	১১	২৫	৫.৭২
৫০-৫৪	১১	০৯	২০	৪.৫৮
৫৫-৫৯	১১	১৫	২৬	৫.৯৫
৬০-৬৪	৯	৭	১৬	৩.৬৬
৬৫ ও তদূর্ধ্ব	৭	১১	১৮	৪.১২
মোট			৪৩৭	১০০.০০

(মাঠ পর্যায় থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সংগৃহীত উপাত্ত) (পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৪৬ জন)

১.২ প্রধান ও অ-প্রধান পেশা

অধিকাংশ জেলে পরিবার তাদের প্রধান পেশা মৎস্য আহরণ বর্জন করে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। নদী, বিল, হাওর, খাল, কোথাও তাদের আর স্বাধীন ও বিনা পয়সায় মাছ ধরার সুযোগ না থাকায় তারা অনেকটা বাধ্য হয়েই পূর্ব পুরুষের পেশা পরিত্যাগ করে নতুন নতুন পেশায় জড়িত হচ্ছে। ২০০৯ সালে জারিকৃত 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯' এর ধারা ২(খ)-এ বর্ণিত আছে যে, "প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল-ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না (ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯)।"

কিন্তু বাস্তবে জেলে পরিবারগুলো তার বাস্তবায়ন দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, প্রকৃত মৎস্যজীবী না হয়েও কিছু সমিতি প্রভাবশালীদের আশীর্বাদে ইজারায় (লিজ) অংশগ্রহণ করতে পারছে, আর তারা ইজারাও পেয়ে যাচ্ছে। আবার যে সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত জেলেরা লিজ নিতে পারছে, সেখানেও অ-প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিগুলো প্রকৃত জেলেদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে অথবা সামান্য লাভ দিয়ে জলমহালগুলো কিনে নিচ্ছে। প্রকৃত জেলেরা প্রাণের ভয়ে জলমহাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরে মাছ ধরার কাজ না পেয়ে জেলেরা তাদের প্রাচীন পেশা ত্যাগ করে নতুন নতুন পেশা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করছে (হোসেন, ২০১১)। ৮০টি নমুনা পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩৭টি পরিবারের বর্তমান প্রধান পেশা মাছ ধরা। বাকী ৫৩টি পরিবারের মধ্যে ১১টি পরিবার পুরোপুরিভাবে মাছ ধরা পেশা পরিত্যাগ করেছে। ৩২টি পরিবার মাছ ধরাকে তাদের অ-প্রধান পেশা হিসেবে গণ্য করেছে। নমুনা জেলে পরিবারসমূহের মতানুসারে প্রতি বছরই বাড়ে যাচ্ছে মাছ ধরা পেশার লোকজন আর গ্রহণ করছে নতুন নতুন পেশা। নতুন পেশায় তাদের গমন প্রক্রিয়া ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা তাদের পেশায় আর অবস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে না বা তাদের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হচ্ছে না। আরও উল্লেখযোগ্য, তারা কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে তেমন আগ্রহী হচ্ছে না, বরঞ্চ শাক-সবজি বিক্রি, মাছ কিনে বিক্রি করা ও নার্সারি করা প্রভৃতি পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে। সারনি ১.২ এ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে:

সারনি ১.২: জেলে পরিবারগুলোর সদস্যদের প্রধান ও অ-প্রধান পেশা

প্রধান পেশার নাম	সদস্য সংখ্যা	শতকরা	অ-প্রধান পেশার নাম	সদস্য সংখ্যা	শতকরা
শিশু (অনূর্ধ্ব ৪ বছর)	৬০	১৩.৭৩	শিশু (অনূর্ধ্ব ৪ বছর)	৬০	১৩.৭৩
ছাত্র	৬৭	১৫.৩৩	ছাত্র	৬৭	১৫.৩৩
মাছ ধরা	৩৭	৮.৪৭	মাছ ধরা	৪৩	৯.৮৪
মাছ বিক্রি	৩১	৭.০৯	মাছ বিক্রি	৪৯	১১.২১
কৃষি কাজ	৯	২.০৬	কৃষি কাজ	২১	৪.৮১
শাক সবজি বিক্রি	৫৭	১৩.০৪	শাক সবজি বিক্রি	৬৪	১৪.৬৫
রিক্সা/ভ্যান চালানো	২১	৪.৮১	রিক্সা/ভ্যান চালানো	২৫	৫.৭২
স্কুটার/অটোরিক্সা চালানো	০৭	১.৬০	স্কুটার/অটোরিক্সা চালানো	০০	০০
বাসের হেলপার	১৩	২.৯৭	বাসের হেলপার	০০	০০
মুদি দোকানদারি	২৮	৬.৪১	মুদি দোকানদারি	০০	০০
মেকানিক	১১	২.৫২	মেকানিক	০০	০০
নার্সারি	৪৯	১১.২২	নার্সারি	৭৫	১৭.১৫
মিনতিগিরি	১৩	২.৯৭	মিনতিগিরি	২১	৪.৮১
গার্ড পদে চাকরি	০৭	১.৬০	গার্ড পদে চাকরি	০০	০০
বিদেশে চাকরি	১৫	৩.৪৩	বিদেশে চাকরি	০০	০০
বেকার	১২	২.৭৫	বেকার	১২	২.৭৫
মোট	৪৩৭	১০০.০০	মোট	৪৩৭	১০০.০০

(মাঠ পর্যায় থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সংগৃহীত উপাত্ত)

১.৩ জেলে পরিবারগুলোর শিক্ষার হার

মোট ৮০টি জেলে পরিবারের ৪৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন এস.এস.সি পাস সদস্য রয়েছে। বাকিদের মধ্যে ৮ম শ্রেণি পাস ১২ জন, প্রাথমিক পর্যায় পাস ৮০ জন, প্রাথমিকের নিচে রয়েছে ৬৭ জন। তাদের গড় শিক্ষার হার শতকরা ৩২.৩০ ভাগ, যা জাতীয় শিক্ষা হারের প্রায় অর্ধেক। শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা লক্ষণীয়। কারণ, খুব নিকটেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকলেও তাদের শিক্ষার হার যথেষ্ট কম।

১.৪ জেলে পরিবারগুলোর মাসিক আয়

জেলে পরিবারগুলো আর্থিক দিক থেকে বেশ শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। তাদের মাসিক গড় পারিবারিক আয় ৪,৫৬২.৫০ টাকা। তার মধ্যে শতকরা ৪৪ টি পরিবারের মাসিক আয় ৩০০০ টাকা বা তার চেয়ে কম। এই ক্ষুদ্র আয় ৫.৪৬ জন (গড় পারিবারিক সদস্য) সদস্যের একটি পরিবারের জন্য বর্তমান বাজার মূল্যে খুবই অপ্রতুল। একটি পরিবার পরিচালনায় ৩ বেলা খাবার জোটানোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া, ঐ আয় শ্রেণির পরিবারগুলোর পক্ষে তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করাও বেশ কঠিন। ফলে, তাদের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। তাদের সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থায় মিনতিগিরি, মাছ বিক্রি, শাক সবজি বিক্রি বা মেকানিকের মত কাজে নিয়োজিত হতে হচ্ছে। তাদের সদস্যদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার মত স্বচ্ছলতা তারা অর্জন করতে পারছে না। সারনি নং ১.৩ এ পারিবারিক আয়ের চিত্র দেখা যেতে পারে।

সারনি ১.৩ জেলে পারিবারের মাসিক আয়

মাসিক পারিবারিক আয়	জেলে পরিবার	শতকরা
অনূর্ধ্ব ৩,০০০ টাকা	৩৫	৪৩.৭৫
৩০০১- ৫০০০ টাকা	১৯	২৩.৭৫
৫০০১-৭০০০ টাকা	১৪	১৭.৫০
৭০০১-৯০০০ টাকা	১০	১২.৫০
৯০০১-১১০০ টাকা	০২	০২.৫০
মোট	৮০	১০০.০০

(মাঠ পর্যায় থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সংগৃহীত উপাত্ত)

১.৫ জেলে পল্লীগুলোর ঘর-বাড়ির ধরন

জেলে পল্লীগুলো প্রধানত দরিদ্র পল্লী, তারা কোন রকমে দিনাতিপাত করছে। তাই তাদের অধিকাংশের ঘর-বাড়ি বাঁশ-খড়, শক্ত ঘাস দিয়ে তৈরি। তবে বর্তমানে বাঁশ ও খড়ের দুর্মূল্যের কারণে অনেকে ঋণ করে টিনের তৈরি বাড়ি বানিয়েছে, কেউ কেউ ইট দিয়ে দেয়াল করে উপরে টিনের ছাউনি দিয়েছে। ৮০টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৬টি পরিবারের দালান ও ঘরের ছাদ ঢালাই অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাদের ৪ জন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রি করে পাকা বাড়ি করেছে, আর ২ জন বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ করে পাকা ছাদ তৈরি করেছে। নিজের মাছ ধরা পেশা বা অন্য কোন পেশা থেকে এখনও তাদের পাকা বাড়ি তৈরি করার মত সংগতি জন্মায়নি।

১.৬ জেলে পরিবারগুলোর চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তি

প্রাচীন কাল থেকে জেলে পরিবারগুলো অসুখ বিসুখে গ্রামীণ প্রচলিত টোটকা চিকিৎসা ও তেল/পানি পড়া প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে তার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটেছে। কয়েকটি এনজিও তাদের স্বল্প ব্যয়ের চিকিৎসা ক্লিনিক খুলেছে পার্শ্ববর্তী তেমুখী মোড়ের কাছে ও টুকের বাজার এলাকায়। যেমন, সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এসএসকেএস) এর 'সূর্যের হাসি ক্লিনিক', সীমান্তিকের 'বর্ণমালা' ক্লিনিক প্রভৃতি। এসব ক্লিনিকের সদস্য হতে হয় ২০ টাকা দিয়ে। তার পরে যেকোন অসুখের চিকিৎসায় (অপারেশনাল চিকিৎসা ব্যতীত) ১০ টাকা ফি দিয়ে তারা চিকিৎসা ও কম মূল্যে বা বিনা মূল্যে ওষুধ পেয়ে থাকে। সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন 'ধাত্রী ব্যবস্থা' বা আত্মীয় স্বজনের সেবা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রসবোত্তরকালে মারাত্মক কোন সমস্যা হলে সিলেট শহরের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায় অথবা বাড়িতে রেখে অর্ধ চিকিৎসায় ভুগতে থাকে বহুদিন। জেলে পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা এখনও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণকে বিলাসিতা হিসেবে গণ্য করে থাকে।

১.৭ জেলে পরিবারগুলোর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ

জেলে পরিবারগুলো সুরমা নদীর তীর ঘেসে গড়ে উঠেছিল। এই স্থানগুলোর অনেক জমিই ছিল নদী তীরের সরকারি খাস জমি। পরে তাদের অনেকেই নিজেরা সামান্য কিছু পরিমাণে জমি ক্রয় করে ঘর বাড়ি বেঁধেছিল। তবে বর্তমান প্রজন্মের লোকেরা জানালো যে, শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে কেনা জমিগুলো তাদের পিতা বা প্রপিতামহের আমলের। তারা কোন জমি ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি। এইসব জমি দিয়ে লোকালয়ের বর্ষার পানি নদীতে নামতো। এখন নদী তীরের কতিপয় এলাকায় বাঁধ দেয়া হয়েছে। ফলে বর্ষার সময় (সিলেট জেলায় বর্ষা মওসুম চলে কম

পক্ষে ৬ মাস) তাদের বাড়িঘরের পাশে পানি জমে যায়। অন্তত ১৭টি পরিবারের বাড়িতে বর্ষা মওসুমে পানি ওঠে। তখন তাদের কষ্টের আর সীমা থাকে না। সারা বছরই দেখা যায় স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। বড়ই অস্বাস্থ্যকর। এরই মাঝে তাদের শিশুরা বড় হচ্ছে। তারা পানীয় জলের ক্ষেত্রে সুরমা নদীর পানিকেই ব্যবহার করে এসেছে এতকাল ধরে। বর্তমানেও রান্নাসহ অন্যান্য কাজে নদীর পানি ব্যবহার করে। তবে টিউবওয়েলের পানি পান করার অভ্যাস অনেকটা গড়ে উঠেছে। তাদেরকে খোলা মাঠের পরিবর্তে বেড়া দিয়ে ঘেরা পায়খানা ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে আসছে স্থানীয় এনজিওগুলো। এখন তার ফলে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে বেড়া ঘেরা পায়খানা দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো স্যানিটারি পায়খানা নয়। ফলে সর্বত্রই বোঁটকা গন্ধ ভেসে আসে। বর্ষাকালে সেগুলো উপচে পড়ে আর সর্বত্রই সৃষ্টি হয় দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি।

১.৭ জেলে পরিবারগুলোর চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম

তাদের চিত্ত বিনোদনের প্রাচীন পদ্ধতি ছিল বর্ষাকালে বিভিন্ন দলের জারি, সারি প্রভৃতি গান শোনা, যেগুলোর গায়করা নৌকায় করে নদী তীরে আসতো। সিলেট এলাকায় দলীয় গান হয় বটে, তবে তা জারি গান নয়, বাউল ও ধামালি গান। আসতো হাসন রাজা, শাহ আব্দুল করিম, রাধারমণের গান নিয়ে বিভিন্ন দল। শীতকালে প্যান্ডেল সাজিয়ে চলতো গান। এরা সবাই কম বেশি চাঁদা দিতো। উপঢৌকন হিসেবে কাপড় ও সাংসারিক বস্তু দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এখন আয় কমে যাওয়ায় তারা আর চাঁদা বা উপহার দিতে পারে না। গায়কের দলও আর আসে না। ফলে গ্রামের কোন বাড়িতে থাকা টেলিভিশনই এখন বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে। গ্রামে কয়েকটি দোকান রয়েছে মুদিখানা কাম চা'য়ের দোকান। সারাদিন সেগুলোতে চালু রয়েছে টেলিভিশন, ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে তা উপভোগ করছে। সন্ধ্যার পরে মহিলারা দল বেঁধে টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এখন এটিই তাদের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপকরণ।

১.৮ বিবাহের বয়স ও পাত্র বাছাই পদ্ধতি

বিবাহের বয়সের হিসাব এদের ক্ষেত্রে মেয়ে 'ডাঙ্গার' (ঋতুবতী) হওয়া। দলীয় আলোচনায় জানা গেল, ১৩ বছরেই মেয়েরা ডাঙ্গার হয়ে যায় এবং তারা মেয়েদের বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করে ফেলে। ১৫ বছরের বেশি বয়সী কোন অবিবাহিতা মেয়ে জেলে পল্লীগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাত্র নির্বাচনের প্রধান শর্ত হলো যে, সে কোন জেলে পরিবারের সন্তান হবে। হতে পারে তার বর্তমান পেশা মাছ ধরা নয়, কিন্তু পূর্ব পুরুষ জেলে ছিল। এর প্রধান কারণ হলো মুসলিম সমাজের সেই প্রাচীন আতরাফ শ্রেণি প্রথা, যা এখন প্রায় বিলুপ্ত, কিন্তু তার জের এখনও রয়ে গেছে। তখন জেলেদেরকে ছোট জাত (আতরাফ) বলে গণ্য করা হতো। তখন একজন সাধারণ মুসলিম প্রতিবেশি পরিবারের বিয়েতেও জেলে পরিবারকে দাওয়াত করা হতো না। সেই ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে বর্তমান প্রজন্মও। ফলে তারা জেলে পরিবার ছাড়া পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে না। সামাজিক ভেদাভেদের (পদবিন্যাস বা স্ট্রাটিফিকেশন) নমুনা মুসলিম ও হিন্দু জেলে পরিবারগুলো এখনও বহন করে চলেছে।

২. পেশা পরিবর্তনের কারণ

পেশা পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উত্তরদাতাবৃন্দ ৫টি কারণকে প্রধান বলে চিহ্নিত করেছেন।

সেগুলো হলো:

১. নদী, বিল, হাওর, খাল বা অন্যান্য স্থানে মাছের আকাল/পর্যাপ্ত মাছ না পাওয়া।

২. অধিকাংশ জলমহাল ভুয়া জেলেদের সমিতি কর্তৃক লিজ প্রাপ্তি।

৩. যে সব জলমহাল কোনভাবে জেলেরা লিজ পায়, সেগুলোতে চাঁদাবাজ/মাস্তানদের উৎপাত, যাতে তাদের লাভ থাকছে না অথবা লাভ অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণে থাকছে।

৪. লিজের অংক এত বেড়ে গেছে যে, তাদের সমিতিগুলো ঋণ করেও সেগুলো লিজ নিতে পারছে না।

৫. তাদের নিজস্ব পুঁজির প্রকট অভাব।

তবে তাদের সঙ্গে একান্তে আলাপ করে কিছু পরোক্ষ কারণ জানা গেছে, যা তারা প্রকাশ করতে নারাজ। সেগুলোকেই প্রকৃত কারণ হিসেবে গণ্য করা যায়। তাদের গোপন করে যাওয়া কারণগুলো নিম্নরূপ:

ক) দরিদ্র ও অসংগঠিত শ্রেণি হিসেবে জেলেদের উপর রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদের, পুলিশের ও স্থানীয় মাস্তানদের তান্ডব অনেক বেড়ে গেছে। তারা একটি বড় মাছ পেলেই ঐ সব শ্রেণির ব্যক্তিরা বিনা পয়সায় বা অল্প পয়সায় সেগুলো নিয়ে যায়।

খ) তাদের একটি নীরব অভিমান কাজ করছে যে, বাপ-দাদারা সকল জলাশয়ে যেখানে খুশি বিনা লিজে মাছ ধরার সুযোগ পেতো, আজ সে সুযোগ অনেকাংশেই প্রায় বন্ধ। 'জাল যার, জলা তার' এই নীতিটি আজ কাগজে কলমে কার্যকর থাকলেও বাস্তবে তা তেমন কার্যকর না থাকায় তাদেরকে 'নিজ ভূমে পরবাসী' হতে হয়েছে। সুতরাং এই পেশাতে আর থাকা উচিত নয়।

গ) শহরের উপকণ্ঠে তাদের পল্লী হওয়ায় অনেক প্রভাবশালী ও মাস্তানদের নজর পড়েছে তাদের জমির প্রতি। তারা বিভিন্নভাবে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে, যেন জেলেরা স্বল্প মূল্যে তাদের ভিটা মাটি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যায়। আশে-পাশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেও এর সত্যতা পাওয়া গেছে।

ঘ) মাছ ধরা একটি কষ্টকর ও ধৈর্য্য পরীক্ষার পেশা। বড় জাল ফেলে আধা ঘণ্টা/এক ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। তারপরে হয়তো মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজে নৌকা বেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভোর রাতে ক্ষুধার্ত পেটে বাড়ি ফিরতে হয়। আবার প্রাপ্ত মাছ মরে যাবে বলে না ঘুমিয়ে দূরের বাজারে হেঁটে বা ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে মাছ বিক্রি করে আসতে হয়। এতে খাওয়ার সময় ঠিক রাখা যায় না, ঘুমানোর সময়ও ঠিকমত পাওয়া যায় না। রোদে পুড়ে পানিতে ভিজে এই পেশাটি বহাল রাখতে হয়। তাদের এ যুগের সন্তানদের মধ্যে এত কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা নাই। তারা একটি স্কুটার নিয়ে ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করলে ৫০০ টাকা অনায়াসে রোজগার করতে পারে। তাই তাদের মধ্যে অলসতা প্রবেশ করেছে, আর ভোগ বিলাস ও আয়াসের জীবনের মোহ এসে গেছে। তাই তারা জেলেগিরি পেশা পরিত্যাগ করে অন্য পেশায়, এমনকি বাপ দাদার ভিটা বিক্রি করে বিদেশ চলে যাচ্ছে।

এতগুলো কারণ থাকার পরেও তাদের মতামত, কারণ যতই থাকুক, পূর্বের মত নির্বিঘ্নে ও লিজ ছাড়া বিনা পয়সায় মাছ ধরার সুযোগ পেলে অনেকেই এই পেশায় অবস্থান করতো (এটি তাদের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় জানা গেছে)।

৩. নব গৃহীত পেশাসমূহ ও তাদের বর্তমান আয়

বর্তমানে জেলে পল্লীর সদস্যরা নতুন নতুন পেশার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাদের পুরোনো ও চৌদ্দ পুরুষের পেশা তাদেরকে আর ধরে রাখতে পারছে না। নদী তীরে বাড়ি হলেও নদীর পানিকে আর তাদের বৈঠার আঘাত খুব বেশি সহ্য করতে হচ্ছে না। তারা যেন অভিমান করে জলাশয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে। চলে যাচ্ছে সেই সব পেশায়, যে গুলোতে এতোটা শারীরিক পরিশ্রম নেই, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করা যায়, লোকসানের ঝুঁকি খুবই কম- নেই বললেই চলে, মাস্তানী-চাঁদাবাজদেরকে তোয়াজ করতে হয়না।

পেশা পরিবর্তনের মূলধন জোগাচ্ছে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওসমূহ। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প থেকে আসছে মূলধন। সামান্য কয়েকজন ওয়ারিশি সূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রি করে নতুন পেশার মূলধন গঠন করেছে। পূর্বে বাবার আমলে নদী তীরের যেসব জমির মূল্য খুবই কম ছিল, সেগুলো উপ-শহর হয়ে যাওয়ায় মূল্য বেড়েছে কয়েক শত গুণ। তাই সামান্য কিছুটা বিক্রি করেই চলে আসছে অনেক টাকা। শহরায়নের সূত্র অনুসারে অনেকে তাই সে সব জমি বিক্রি করে মাইল দুয়েক দূরে অল্প টাকায় জমি কিনে বাকি টাকা দিয়ে পাকা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। যে সব এনজিও তাদেরকে নতুন পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলধন জোগাচ্ছে, তাদের মধ্যে ব্র্যাক, ভার্ড, এফআইভিডিবি (ফ্রেন্ডস ফর ইনটিগ্রেটেড ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ), এসএসকেএস (সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা), সীমান্তীক, এসজেএ (সিলেট যুব একাডেমি), অন্যতম।

বেশির ভাগ সদস্য চলে যাচ্ছে মুদি দোকানদারি, শাক-সবজি বিক্রি ও মাছ বিক্রির দিকে। এর সঙ্গে রয়েছে স্কুটার ও রিকসা/ভ্যান চালানো। মহিলারা চলে যাচ্ছে নার্সারি পেশায়, সেটিরও মূলধন জোগাচ্ছে এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প। নার্সারি পেশায় মায়েদের সঙ্গে শিশুরাও এই পেশায় যাচ্ছে, বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা। তাদের ধারণা, এই পেশাগুলোর কোনটিতেই লোকসানের ভয় নেই। সঠিকভাবে কিস্তি পরিশোধ করেও তাদের লাভ থাকছে। যারা মাছ ধরা পেশা ছেড়ে চলে গেছে, তাদের মধ্যে পুরুষদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মূলধন নিয়ে মাছ বিক্রির পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। তারা বলেন, "চিরকাল মাছ ধরেছি, মাছ বিক্রি করেছি, এখন মাছ ধরা বাদ দিয়েছি বটে, তবে চিরচেনা পেশা মাছ বিক্রিটা সহজে ও দক্ষতার সঙ্গে করতে সক্ষম হচ্ছি, অন্য পেশায় গেলে নতুন হিসেবে হয়তো ভালো করতে পারবো না।"

উল্লেখ্য, খুবই কম সংখ্যক জেলে কৃষি কাজকে পরিবর্তিত পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তার কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে, "কৃষি কাজ সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো ধারণা নেই। বাপ দাদারা কোনদিন করেননি তো, তাই এখন দু চার জন শুরু করেছেন, কিন্তু অন্যরা ভয় পাচ্ছেন। তা ছাড়া কৃষি কাজ তেমন একটা লাভজনক পেশা নয়। ওতে ৫/৬ সদস্যের একটি পরিবার চালানো সম্ভব হচ্ছে না।"

কেউ কেউ বাবার জমি বিক্রি করে বিদেশ চলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রবীণরা জানান, "সাধারণ মুসলিম ও হিন্দু পরিবারগুলো আমাদেরকে এখনও হেয় মনে করে ঘৃণার চোখে দেখে। তা ছাড়া জেলে পরিবার ছাড়া আমাদের এখনও বিয়ে হয় না অন্য মুসলিম পরিবারে। কিন্তু যখন একজন ইংল্যান্ড গিয়ে অনেক টাকা কামাই করে আনছে, তখন সে যে

কোন মুসলিম পরিবারে বিয়ে করতে পারছে। এটিও হয়তো অন্য যুবকদেরকে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করছে।"

আগে জেলে পল্লীর কোন সদস্য অন্যের অধীনে কখনও চাকরি করতো না। জেলেরা নিজেদেরকে স্বাধীন পেশার অধিকারী মানবগোষ্ঠি বলে চিন্তা করতে ভালবাসতো। তবে এখন পেটের দায়ে কিছু ব্যক্তি বাজারে নাইট গার্ডের চাকরি নিয়েছে, বেশ কিছু তরুণ বাসের ড্রাইভারের অধীনে হেলপারগিরির চাকরি নিয়েছে। কেউ কেউ গ্যারেজে মেকানিক হিসেবে চাকরি নিয়েছে। এদেরকে এখনও জেলে গোষ্ঠির প্রবীণ লোকেরা ভালো চোখে দেখছে না। চাকরি করাকে তারা চাকরের কাজ বলে এখনও মনে করে।

নতুন করে গ্রহণকৃত সব পেশাতেই তাদের আয় বেড়েছে। তবে যারা গার্ডের, মেকানিকের ও হেলপারের চাকরি নিয়েছে, তারা কোন মতে দিনাতিপাত করছে। বাকি সব নতুন পেশার লোকেরা কিছু সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে এবং সঠিকভাবে কিস্তি শোধ করতে পারছে। চাকরিরতদের বাদ দিলে নতুন পেশার লোকদের আনুমানিক মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার কম নয়। এদের পরিবারে টিভিসহ অন্যান্য আসবাবপত্র দেখে একটু ভালো অবস্থায় আছে বলে অনুমান করা যায়। এমনকি, যারা কেবল মাছ বিক্রি করে (মাছ ধরে না), তারাও ভালো আছে।

৪. যারা এখনও জেলে হিসেবে মাছ ধরা পেশায় রয়েছে, তাদের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ

যারা এখনও জেলে হিসেবে মাছ ধরা পেশায় রয়েছে, তাদের বেশির ভাগই বয়সে প্রবীণ। এ ৮টি জেলে পল্লী নিয়ে একটি 'জেলে কল্যাণ সমিতি' নামে সমিতি আছে। তার সভাপতি জনাব হিরু মিয়া (ছদ্ম নাম)। তার বয়স প্রায় ৭৫ বছর। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে তিনি বলেন, "স্মৃতি ভুলতে পারি না বাবা, তাই এই পেশায় আছি। ছোট বেলায় বাবার সঙ্গে মাছ ধরেছি ওই বহুয়ার বিল, বাইক্কা বিল, জামকী বিল, হাকালুকি হাওর, সুরমা নদীতে। তখন তো কেউ মাছ ধরতে নিষেধ করতো না। আমরা মনে করতাম পৃথিবীর যেখানে মাছ আছে, সেখানেই আমাদের জাল ফেলার অধিকার আছে। এখন সমিতি থেকে আমরা লিজ নিতে যাই, অ-জেলের সমিতিগুলোই বেশি টাকা দিয়ে লিজ পেয়ে যায়। আমরা যে জেলে, আমাদের যে অগ্রাধিকার আছে, এই কথাটাই কেউ স্বীকার করে না, সরকারও কোন ব্যবস্থা করে না। তাই মাত্র ২ টা জলাশয় আমরা পেয়েছি লিজে, এখন ২৪৭টি পরিবার এ ২ জলাশয়ে কীভাবে সারা বছর লিজের টাকা শোধ করে দিন পার করবো, এক আল্লাহই জানে।"

প্রবীণরা হয় মাছ ধরার প্রতি ভালবাসায় অথবা অন্য কোন পেশায় যাবার ঝুঁকি নিতে না পারায় এই পেশাতেই রয়েছে। তা ছাড়া ঋণ গ্রহণকে তারা খুব ভয় করে। তারা শিক্ষিতও নয়। তাই নতুন মূলধন জোগানের বিষয়টি বুঝতে পারে না। তারা কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজকে খুব ভয় করে। আর কিছু পরিবার আছে, যারা নদী বা বিলের কাছাকাছি অবস্থান করে তারা সুবিধাজনক মনে করে এই পেশায় রয়েছে। কারণ যেটিই হোক না কেন, তারা এই পেশাকেই আঁকড়ে ধরে আছে।

একজন জেলে জানালো, গত রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত সে নদীতে জাল ফেলে ছিল। সারা রাতে মাত্র ১০০ টাকার মাছ পেয়েছে। তার পরিবারে ৫ জন লোক, এই টাকা দিয়ে তার দিন চলবে না। অথচ সে রাত জাগা মানুষ, সারা দিন তাকে ঘুমাতে হবে। অর্থাৎ নদীতে মাছের আকাল খুবই প্রকট, যা ২০ বছর আগে এরূপ ছিল না। তখন সারা রাত জাগলে কম পক্ষে ১০০০ টাকার মাছ পেতে পারতো। তাদের মতে সুরমা নদীর উজানে বরাক নদীর কোন না কোন স্থানে বাঁধ দেয়ার ফলে বিগত ২০ বছর ধরে বড় মাছ আর আসছে না। যতই দিন যাচ্ছে, ততই মাছের আকাল তীব্রতর হচ্ছে।

তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বক্তব্য থেকে নিম্নে বর্ণিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে:

ক) নদী, খাল, বিল, হাওরে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠা মাছের তীব্র অনটন।
খ) জেলেদের জলাশয়ের উপর অধিকার হ্রাস প্রাপ্তি।
গ) ওপেন টেন্ডারে লিজ প্রদানে জেলেদের অগ্রাধিকার না দেয়া।
ঘ) জেলেদের লিজ নেয়া জলাশয়ে চাঁদাবাজি ও মাস্তানির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
ঙ) প্রয়োজনে সরকার থেকে জেলেদের মূলধন গঠনে বিনা জামানতে ও সুদে টাকা প্রদানের ব্যবস্থা না করা।
চ) জেলেদের লিজ নেয়া মৎস্য ক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগ ও জোর করে মাছ মেরে নেয়ার বিচার না পাওয়া।
ছ) বয়স্ক জেলেদের ভাতার আওতায় না আনা।

এই সকল বিষয়ই জেলেদের বর্তমানে তীব্র অনুভূত সমস্যা। এগুলোর দিকে কোন জন প্রতিনিধি, কোন মন্ত্রী বা কোন প্রশাসক কখনই নজর দিচ্ছেন না। হিরু মিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, "আমরা ক'জন প্রবীণ জেলে মারা গেলে এই এলাকায় কোন জেলে পল্লী ছিল তা কেউ আর সনাক্ত করতে পারবে না।"

তাদের মানসিক সমস্যাগুলোও পর্যালোচনার দাবি রাখে। পূর্বে এই ৮টি গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল জেলে। শহরের উপকণ্ঠে হওয়ায় এবং তুলনামূলকভাবে জমির দাম কম হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী কম দামে জমি কিনে নিয়েছে গরিব জেলেদের নিকট থেকে। জমি বিক্রি করে চলে যাওয়া জেলেরা এখন ৩/৪ মাইল দূরে গিয়ে কম দামে জমি কিনে পাকা ঘর বানিয়েছে। এখন যে সব জেলে এই গ্রামগুলোতে অবস্থান করছে, তারা চূড়ান্তভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গেছে। ফলে তাদের শক্তি কমে গেছে এবং স্বজন দূরে চলে যাওয়ার তারা মনোকষ্টে ভুগছে। সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ফলে তাদের প্রতিরোধ শক্তিও মারাত্মকভাবে কমে গেছে। ফলে তাদের পক্ষে সুরমা নদীতে মাছ ধরতে বাধা দেয়া লোকদের ত্রাস এবং লিজ নেয়া জলাশয়ে অবাধে মাছের চাষ করতে বাধা দেয়া গোষ্ঠির মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ভাবে চলতে থাকলে তারা এই পেশায় থাকার নিঃশেষ প্রায় শক্তির অবশিষ্টটুকুও হারিয়ে ফেলবে।

তাদের ভয় হচ্ছে, সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ফলে ভবিষ্যতে তাদেরকে বিয়ের পাত্র-পাত্রী জোগাড় করতে অনেক দূর যেতে হবে। তারা গরিব বলে এমনিতেই তাদের জীবন যাপনে যুথবদ্ধতার

অনেক বেশি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ক্রমাগতভাবে তারা তাদের স্বগোষ্টিকে হারাচ্ছে। তাই তারা ভবিষ্যতের অসহায়ত্বকে এখন থেকেই আশঙ্কিত চোখে দেখছে।

সুপারিশও উপসংহার

জেলে সম্প্রদায় একটি অতি প্রয়োজনীয় ও উপকারী সম্প্রদায়। তাদের আহরিত মাছের জোগান থেকে শহরে সম্প্রদায়ের নিত্য দিনের মাছের জোগান সচল থাকে। তাছাড়া তারা একটি প্রাচীন সম্প্রদায়ের উত্তরপুরুষ। তাদের বিলুপ্তি সমাজের ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটাবে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য কিছু নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয়। তাদের কল্যাণ সাধনে নিম্নে কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো। উল্লেখ্য, এই সব সুপারিশের অনেকগুলোই জেলে সম্প্রদায়ের পেশকৃত সুপারিশ থেকে নেয়া হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১. প্রাচীন কালের আপ্ত বাক্য "জাল যার, জলা তার" (১৮৮৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত জেলে সম্প্রদায় যে কোন নদী, খাল, বিল, হাওর ও বাওরে অবাধে মাছ ধরতে পারতো। কিন্তু ১৮৮৯ সালে বৃটিশ সরকার 'দি প্রাইভেট ফিসারিজ প্রটেকশান এ্যাক্ট-১৮৮৯' নামক আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিল, ও বদ্ধ জলাশয়, যেখানে ব্যক্তিগত জমি বিদ্যমান এবং তা কেবল বর্ষাকালে জলাবদ্ধ থাকে, সেগুলো লিজ দেবার আইন জারি করে। তার ফলে তাদের সেই অবাধ অধিকারটি খর্ব হয়ে যায়। তারপরেও এই সম্প্রদায় উন্মুক্ত জলাশয়ে ও বড় আকারের হাওর-বাওরে বিনা লিজেই মাছ ধরে বিক্রি করে আসছে। তাদের নিজেদের বানানো প্রবাদ হচ্ছে, জাল যার, জলা তার। বাস্তবে এটির কোন আইনগত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না এখন আর বিদ্যমান নাই। ২০০৯ সালে জারিকৃত 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯' অনুসারে এখন সকল জলাশয় (উন্মুক্ত ও বদ্ধ) টাকার বিনিময়ে লিজ দেয়া হয়ে থাকে। তবে এই নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই কেবল লিজ পাবার অধিকারী। সেই নীতি অনুযায়ী জলাশয় লিজ দেয়ার সময় সত্যিকার জেলে সম্প্রদায়কে সনাক্ত করে অগ্রাধিকার প্রদান ও তুলনামূলকভাবে কম দামে লিজ দেয়া হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২. তাদেরকে বিনা জামানতে ও বিনা সুদে ঋণ দেয়ার বিধান বলবৎ করতে হবে।

৩. তাদের পল্লীগুলোর কাছাকাছিতে ফ্রি সরকারি ক্লিনিক বা ডিসপেনসারি খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. তাদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসরতার জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা এবং ঝরে পড়া রোধ করার জন্য প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে প্রতিকার করতে হবে।

৫. জেলেদেরকে উত্যক্তকারী বা চাঁদাবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

৬. বিভিন্ন স্থানে জলাশয়ে বিষ প্রদান বা জোর করে মাছ ধরে নেয়ার প্রতিকার করতে হবে।

৭. তাদের গোত্রের জমি তাদের লোকদের নিকট বিক্রির নীতি ও আইন প্রণয়ন করতে হবে। অন্যথায় তারা ক্রমাগতভাবে সংখ্যালঘু হয়ে যেতে যেতে এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৮. যে কোন উন্মুক্ত জলাশয়ে তাদেরকে মাছ ধরার অধিকার দিতে হবে। লিজ নেবার ব্যবস্থাটি জেলেদের জন্য শিথিল করতে হবে।

৯. বয়স্ক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলে সম্প্রদায়ের জন্য কোটার ব্যবস্থা প্রত্যেক ওয়ার্ডে (যেখানে জেলে পল্লী রয়েছে) করতে হবে। সেগুলোতে ২/৩ জনের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

১০. ব্যাংক একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে তাদের জন্য অন্যান্য কৃষকের মত মাত্র ১০ টাকা জমা করার ব্যবস্থাটি বহাল করতে হবে।

তাদের পেশকৃত সুপারিশগুলোকেই একটুখানি পরিমার্জিত করে এখানে পেশ করা হলো। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি হয়তো শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা যাবে না। কিন্তু তাদের বর্তমান অসহায়ত্ব ও দিনাতিপাতের সমস্যাগুলো খোলা মনে একটু ভেবে দেখা দরকার। তা না হলে আমাদেরকে জেলে সম্প্রদায় বোঝাবার জন্য উত্তর পুরুষের নিকট ইতিহাস পেশ করতে হবে।

উপসংহার

প্রাচীন বাংলাদেশে বসবাসকারী বেশ কিছু পেশার জনগোষ্ঠি তাদের উপার্জন কমে যাওয়ায় বা পেশা বহাল রাখার মত কর্ম না থাকায় বিলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন, পালকি বয়ে নিয়ে যাওয়া 'বেহারা' জনগোষ্ঠি, ঘোড়ার গাড়ি চালানো 'কোচোয়ান গোষ্ঠি', হাতি চালানো 'মাহুতগোষ্ঠি', গাধার পিঠে কাপড় বয়ে নিয়ে যাওয়া 'ধোপা গোষ্ঠি' এখন বিলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত সম্প্রদায়। ওই সকল পেশায় তারা তাদের জীবন যাপনের মত রোজগার করতে না পেরে টিকে থাকতে পারেনি। বর্তমানে তারা অন্য পেশা গ্রহণ করে জীবন যাপন করছে। অনুরূপভাবে যদি এখনই উপার্জনের বা টিকে থাকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে হয়তো জেলে গোষ্ঠিও তাদের পেশা পাল্টিয়ে অন্য পেশায় চলে যাবে। এখনই তার সমূহ আলামত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অন্য ক্ষুদ্র পেশার জনগোষ্ঠির বিলুপ্তিতে হয়তো বা প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠির এই দেশে তেমন তীব্রতর অভাব অনুভূত হয়নি, কিন্তু জেলে পেশার এই জনগোষ্ঠি একটি বিশাল জনগোষ্ঠি। দেশের সব প্রান্তেই তারা ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে হাওর অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহ, যেমন: নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, নড়াইল, রাজবাড়ী এলাকায় তাদের বসবাস অনেক বেশি। এরা যদি সত্যিই কোন কারণে পেশা পরিবর্তন করে নতুন পেশায় স্থানান্তর করে চলে যায়, তাহলে মাছের জোগান প্রদানসহ মিষ্টি পানির মাছের জাত সংরক্ষণে দেশে বেশ একটা ঘাটতি অনুভূত হতে পারে।

তাদের সমস্যাগুলো বেশির ভাগই সমাধানযোগ্য। পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অনায়াসেই ভুয়া জেলে সমিতিগুলোর লিজ গ্রহণ বাতিল করা যেতে পারে। সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে তাদেরকে ঋণ দেয়া যেতে পারে। তাদেরকে সামান্য একটু কম দরে জলমহাল লিজ দেয়া যেতে পারে। তাদের সন্তানদের শিক্ষার্জনের পথ সুগম করে দেয়া যেতে পারে। তাদের উপর অত্যাচারকারী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা যেতে পারে। এই সহজ, সরল ও কষ্টসহিষ্ণু একটি সম্প্রদায়কে তাদের পেশায় টিকিয়ে রাখা গেলে বাংলাদেশের বিশাল এলাকার মৎস্য আহরণসহ মাছের চাষ বৃদ্ধি করাও সম্ভব হতে পারে। তারা দেশি মাছের চাষ বৃদ্ধিতে বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাদের মাধ্যমে হাওর-বাওর, খাল-বিলের আদি ও অকৃত্রিম মনোলোভা দৃশ্যগুলো টিকিয়ে রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের নীতি নির্ধারক ও প্রশাসকদের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। অবশ্য তার সাথে থাকতে হবে সুদূরপ্রসারী নীতি ও পরিকল্পনা।

তথ্য নির্দেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়। ২০১৫। বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা)। প্রজ্ঞাপন। "মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের সংশোধনী"। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয় (জুন ২৫, ২০১৫)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ২০১৩। প্রটেকশান এ্যান্ড কনভেনশান অব ফিস এ্যাক্ট ১৯৫০-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশকরণ। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয় (২৯.০৯.২০১৩)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি মন্ত্রণালয়। ২০০৯। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয় (২৩.০৬.২০০৯)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়। ২০০৮। প্রজ্ঞাপন। "মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের সংশোধনী" (পিরানহা মাছ বিক্রয়, বিপণন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত)। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয়।

হক, মোহাম্মদ মুমিনুল। ২০০৬। সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত। ঢাকা: গতিধারা, বাংলাবাজার।

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার। অ্যাকোয়া কালচার মেডিসিন্যাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয়।

The Government of Bangladesh, M/O Fisheries & Livestock. 1985. *The Ammendment of Protection and Conservation of Fish Act-1950.* Dhaka: Govt.Gazzette.

The Government of Bangladesh, M/O Agriculture (Fisheries & Livestock Division). 1983. The Marine Fisheries Rules-1983. Dhaka: Govt.Gazzette.

The Government of Bangladesh, M/O Law & Land Reforms (Law & Parliamentary Affairs Division's Notification). 1983. *The Fish & Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance.* (Ord. no. 20 of 1983). Dhaka: Govt.Gazzette.

The Government of East Bengal Legislative Department. 1950. *Protection and Conservation of Fish Act-1950.* (East Bengal Act-18 of 1950). Ducca, East Pakistan.

The Government of Bengal. 1939. *The Tanks Improvement Act-1939.* (Bengal Act No. 15 of 1939). Calcutta, India.

The Government of Bengal. 1889. *The Private Fisheries Protection Act-1889.* (Bengal Act No. 2 of 1889). Calcutta, India.

Hossen, Billal. 2011. *The Socio-economic Condition of the Fishermen: A Study on Peerpur Village.*(An unpublished thesis of MSS degree, Dept. of Social Work, SUST).Sylhet.